বেল মালা

ড. শিবশঙ্কর পাল

ন্যাড়া বেলতলা একবার যায়। এই প্রবাদ আজও মুখে মুখে ফেরে। যজ্ঞ করতে লাগে বেলকাঠ। পুজোয় লাগে বেলপাতা। বেল কাঠের লাঠি লাগে উপনয়নে। পাকা বেল পেটের পক্ষে খুব উপকারী। ধর্মআচরণের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে বেলের আরেকটা দিক। যেটা তৈরী করে মূলত মহিলাদল।

ঘুরছিলাম পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি জেলা। খুঁজছিলাম প্রান্তিক বা নাগরিক মহিলাদের। তাদের জীবিকা জীবন নিয়ে চলছিল সন্ধান। তাদের আয়ের উৎস কোথা, তারা কী কী কাজ করে, তাদের অভাব, অভিযোগ শুনছিলাম। জীবিকা বাঁচাতে গিয়েই ওরা কোনও কোনও শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখছে। জীবিকার বা অর্থ আয় হেতু কঠিন কায়িক পরিশ্রমী কাজও করছে। এভাবেই চলছে ওদের জীবন। যাদের কাছে 'হাত আর পা / খাট আর খা' এই লোককথাটি খুব সত্যি। হাত আর পা খাটিয়েই চলে ওদের জীবন। বাঁকুড়া বিষ্ণুপুরের নানা গ্রামে বহু মহিলার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে যারা নানারকম কাজ করে।

সেসব মহিলাদের কাজের সন্ধান করতে গিয়ে আমরা খোঁজ পেলাম, জানতে পারলাম বেল মালা তৈরীর কারিগরি বিদ্যা। বেল মালা তৈরী করে ওদের কতটুকু আয় হয়। তাদের জীবনের ছোট বড় কথা। বেল মালা তৈরীর সন্ধান পেলাম মাটিয়ালা বা মেটেলা, গৈগরা, কুস্তল, পাঁচমুড়া, শুশুনিয়া প্রভৃতি গ্রামগুলোতে। গ্রামের ঘরে ঘরে মহিলারা এই কাজটি করে আছে বছরের পর বছর। কেও কাজটি শিখেছে দেখে দেখে। কেও শ্বাশুড়ি বা জা-এর কাছে। রাসমনি মল্ল, রিতা মল্ল, সোনালী কর্মকার, লক্ষী কর্মকারের মতো বহু বহু মহিলারা আছে এসব গ্রামে, যারা বেল মালা বানিয়ে স্বনির্ভর হচ্ছে। নিজের হাত খরচ নিজেই আয় করছে। তবে এই কুটির শিল্পকে শিল্পের দরজা দেওয়া হয়নি। কোনও মহিলা শিল্পী সেভাবে স্বীকৃতি পায়নি বাইরের জগতের আলোকে। নতুন নতুন মেয়েরা এই কাজে আসতে চাচ্ছে না। যদিও কিছু কিছু স্কুল-কলেজ পড়ুয়া মেয়ে আছে যারা মাসের কাজে সাহায্য করে। বেল মালা বানাতে লাগে 'ছক' ও 'ধনুক' নামে দুটো লোকযন্ত্র। যা মহিলারা নিজেরাই বাড়িতে বানায়। **কিনতেও পাওয়া যায় ছক-ধনুক।** লাগে ছোট নারকেল মালার টুকরো। যাকে 'পিটটাল' বলা হয়। বেল ফলকে প্রথমে শাঁসহীন করা হয়। ধোয়া হয় ভালো করে। পরে ছকের সাহায্যে, ধনুক চালিয়ে বেলের ওই খোলাকে কাটা হয়। বেল খোলা পুরু বা মোটা হলে মালার পুঁতি হয় ভালো। খোলা পাতলা হলে অতটা ভালো হয়না বেল মালা। ধনুকের দুদিকে থাকে ছোট-বড় দুটি সূঁচ। প্রথমে বেলের খোলাকে ভিতর দিয়ে ধনুক ঘুরিয়ে ফুটো করা হয়। পরে বেল খোলার উপর দিক থেকে আবার ছক ধনুক চালিয়ে কাটা হয় পুঁতি। এভাবে অসংখ্য পুঁতি কাটা হয়ে গেলে, একসঙ্গে অনেকগুলো তারের ভিতরে পুঁতিগুলো ঢোকানো হয়। তারপর সুতো পরিয়ে দিলেই তৈরী হয়ে যায় বেল-মালা। যা কেও কণ্ঠে ধারণ করে। কেও ভজে হরিনাম। যা বিয়ে, কাজে, পুজোতেও লাগে। তবে বেল মালার সাইজের পার্থক্য আছে। ১৬ ইঞ্চি, ১৮ ইঞ্চি, ২০ ইঞ্চি প্রভৃতি নানা দৈর্ঘের মালা হয়। দৈর্ঘ্য অনুযায়ী তাদের দামও নানারকম। সোনালী কর্মকার, লক্ষী কর্মকার, অর্চনা কর্মকারদের দেখে ছিলাম ওই ছক ধনুক চালিয়ে মালা তৈরী করতে। ওদের কাছেই জেনে নিয়েছিলাম এই কাজের আয়ের দিকটি। আর ওদের জীবনের কিছু কথা। ওরা বেলের খোলা আর সুতো নিজেরাই কেনে। ৮০টি বেল খোলা কিনতে লাগে ২৪০-২৮০টাকা। চারটে বেলের খোলা থেকে বানানো যায় ২০টি বেল মালা (১৬ ইঞ্চি দৈর্ঘ্যের)। যে কুড়িটি বেল মালা ওরা বিক্রি করে ১০৫ টাকায়। হরেগড়ে কুড়িটি মালা বেচে ওদের লাভ হয় ৮৫টাকা মতো। অতগুলো মালা তৈরী করতে সময় লাগে একদিন। ঘরের কাজের ফাঁকে ঠিক সময় বার করে ওরা মালা কাটতে বসে। এভাবেই সারা মাসে ওরা গড়ে ২১০০ থেকে ২২০০ টাকা আয় করে। সোনালী কর্মকারের মতে এই কাজে কিছুটা কষ্ট হয়। হাত ব্যথা করে। কিন্তু কাজ করতে করতে ওসবকে আর কষ্ট মনে হয়না। তাছাড়া এই কাজটা করে, আয়ের অর্থটা নিজেই খরচ করে। স্বামীর মুখাপেক্ষী হতে হয়না তাকে। চনমনে ও সুভাষী এই মহিলা বেল মালা শিল্পী বলে যাচ্ছিল আরও অনেক কথা। তার যদি মেয়ে থাকতো তাহলে তাকে

এই কাজটি সে করতে দিত না। নিজে যে কাজ করছে, সে চায় না নতুন মেয়েরা সে কাজে আসুক। বরং তারা পড়াশোনা করে, চাকরির জন্য চেষ্টা করুক। আবার স্বল্প আয়ের এই কাজটি করে সে মনের আনন্দে। নিজেই বেল খোলা সুতো কিনে আনে। নিজেই ধনুক চালায়। মালা গাঁথে। বিক্রি করে। শুশুনিয়া পাহাড়ে পাথর আর টেরাকোটার পুতুল নিয়ে তার একটি স্টল আছে। স্টল নম্বর ২০। রাসমনি মল্ল বা রিতা মল্লদেরও প্রায় একই কাহিনি। তারাও এসব কাজ করে কিছুটা পুঁজি করেছে। তবে শিল্পীর দরজা তারা পায়নি। পায়নি শিল্পকে বাঁচানোর জন্য বড় রকমের লোন। ওরা কারোর সাহায্য ছাড়া নিজেরাই স্বনির্ভর হয়ে উঠেছে। আবার এসব মহিলা শিল্পীর নিজস্ব স্বাধীনতা আছে। যা জানাল রিতা মল্ল— 'দেখুন বেলের মালাটা মোটা হলে তা কাটতে একটু কষ্ট হয়। হাতে-পেশীতে চাপ লাগে। তবে কাজটা আমার কাছে আনন্দের। যখন মনে হবে কাজ করবো। যখন মনে হবে করবো না। কেও কিছু বলতে পারবে না। স্বামীও না। কেননা এটা আমার কাজ। তাই নিজের মন-মর্জি মতো কাজ করি আমি। তবে চায়না গ্রামের পড়াশোনা করা মেয়েরা এই কাজে আসুক।' এই কুটির শিল্পটি, এসব মহিলা শিল্পীরা (বাঁকুড়ার) পোড়ামাটির ঘোড়া আর পাথর শিল্পের আড়ালে আজও অজ্ঞাত বহু মানুষের কাছে। তাদের হাত না থাকলে নদীয়া বা অন্যান্য জেলার বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের গলায় মালা পরাত কারা! হরি ভজার মালা গাঁথত কারা!